জাতপাতের বিজ্ঞান গবেষণা : ভূত তাড়ানো না ভয় বাড়ানো?

তুষার চক্রবর্তী

সমাজ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের যে জটিলতা ও গভীরতা তাকে অসামান্য বললেও বোধহয় সবটা বলা হয় না। তাই সে নিয়ে অনেক কথা যদিও বলা হয়েছে - তবু কিছুই হয়তো বলা হয়নি। মানবসভ্যতা যদি আজ তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়া বড় বড় সংকট কোনোমতে কাটিয়ে উঠে অন্ততঃ আরো কয়েক দশক টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তাহলে এই বিষয়টি সম্ভবত আগামী দিনে জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে। বর্গীকরণ, বিশেষিকরণ, খন্ডজ্ঞান, চাপিয়ে দেয়া মতাদর্শ, এই জাতীয় বাস্তবতায় শাসকের মতই সতত শশব্যস্ত বর্তমানের বুদ্ধিমার্গ জীবনের সত্যিকারের জটিলতা ও গভীরতার মধ্য প্রবেশ করতে বিমুখ। আর কতকটা সেই বিমুখতার কারণেই সামাজিক বিষয়কে চটজলদি কোন না কোন বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করার যেসব প্রয়াস চলে - তাদের মধ্যে অতিসরলীকরণের উপদ্রব চোখে পড়ার মতো। এই ধরনের কাজে তাই সত্যিকারের সৎ ও কৌতুহলী বিজ্ঞানীরা অনেকেই সাড়া দেন না। আর, সেই সুযোগে, যাঁরা এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের সবার না হলেও অনেকের মধ্যেই উঁকি মারে হয় বিতর্কের আঁচে মৌতাত জমাবার ইচ্ছে, নয়ত আরো নেতিবাচক কোনো মতলব বা কর্মসূচী।

জাত এবং ভূত— সমস্যা হিসেবে দুটোই যেন অনেকখানি একজাতের। ভূতের ওঝা যেমন ভূত তাড়ানোর নামে ভূতের ভয় বাড়ানেরা কাজ আসর জমিয়ে করে থাকে, জাতপাতের ওপর বিজ্ঞানের আলো ফেলার কাজ তেমনি প্রকারান্তরে জাত-কে বাস্তব বলে প্রমাণ দাখিল করার কাজেই লাগে। অনেকেরই হয়ত মনে নেই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ জাতিবাদী গবেষণাকে প্রায় নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অতঃপর সবদিক খতিয়ে দেখে ১৯৫১ সালে ঘোষণা করা হল যে মানুষ একটিই প্রজাতিভুক্ত। জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি — সেটা কবিত্ব নয়, সমাজ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও যে হক কথা তাকে মান্যতা দেওয়া হল। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের মানবগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণায় জাতি কথাটা ব্যবহার করা গেলেও এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সর্বজনীন ভান্ডারে জমা রাখতে হবে - যাতে অন্যরা তা যাচাই করতে পারে। অর্থাৎ, বিদ্যাচর্চার ফাঁক দিয়ে জাতপাত সমাজে প্রতিষ্ঠার সুযোগ

না পায় তাও নিশ্চিত করার প্রয়াস নেওয়া হল। তার পরেও ১৯৭৮ সালে মানবাধিকারের আলোয় জাতি ও জাতের নামে বজ্জাতি করার অপচেষ্টাকে নিশ্চিহ্ন করার ডাক দেওয়া হয়েছে, এবং ১৯৯৫ সালে মানবিক বহুত্ববাদকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে দেখার দাবী জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের তরফে। এর কারণ দেশে দেশে এইসব কুপ্রথা এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এসবে উস্কানি দেবার মত পন্ডিত ও ক্ষমতাবানের অভাব যে হয়নি, সেটা দুঃখজনক হলেও সত্যি কথা।

তবু এসব উপেক্ষা করে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জিনচর্চার নামে থেকেই ইতিউতি এই নিষেধের গণ্ডি পেরনো শুরু হয়। আর, এখন এই কাজে লাগানো হচ্ছে ভারতের মত দেশের বেশ কিছু জিনবিজ্ঞানীকে। যাদের আড়াল থেকে চালনা করেছেন হাতে গোনা কয়েকজন মার্কিনি গবেষক। এদের আসল ইচ্ছে— রাষ্ট্রসংঘের ঐ বিধিনিষেধ একটু একটু করে তুলে দেওয়া।

বিজ্ঞানের এ বিষয়ে গবেষণায় বিধিনিষেধ কেন থাকবে — এমন প্রশ্ন কারো মনে উঠতেই পারে। আসলে, এর উত্তরটাও খুব সহজ ও যুক্তিনির্ভর। বিজ্ঞানের ওপর প্রতিবন্ধকতার প্রশ্ন এতে একেবারেই ওঠে না। কেননা জাতের মত একটা সমাজনির্মিত বিষয় নিয়ে বিশুদ্ধ বংশগতি ও জিন-গবেষণা চালানোই হল গাছের আগাটাকে গোড়া বলে দেখাবার ধোঁকাবাজী। কার্যকারণ সম্পর্কটা উল্টে দিয়ে সামাজিক আরোপিত বিধিকে তা প্রকৃতিদত্ত বলে দাড় করাতে সাহায্য করে। যার ফলাফল, নিছক কোলাহল নয়, শেষতক কতটা হলাহলে পরিণত হতে পারে সেটাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন হিটলার, মুসোলিনী, তোজো। সেই মহাযুদ্ধের মত মহাপাপের শতবর্ষের শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আমরা কি আবার নতুন করে সেই কু-পথে পা বাড়াব? রাজনৈতিক বিচক্ষণতা না থাকলে বিজ্ঞান গবেষণা ও পান্ডিত্য সমাজের মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলই ডেকে আনে।

এদের এইসব গবেষণা কি সিদ্ধান্ত টানে সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ঠিক সেই কারণেই, গবেষণার প্রামাণ্য বিষয় নিয়ে বা ফলাফল নিয়ে তর্ক তোলা এসব ক্ষেত্রে আদ্যন্ত বৃথা— যেখানে গবেষণার ভিতটাই ভুল সিদ্ধান্তের ওপর গাঁথা হয়েছে। যে নামজাদা প্রতিষ্ঠান বা যে দেশের বিজ্ঞানীরাই এসবের সঙ্গে যুক্ত থাকুন না কেন— তাতে তেমন কিছু যায়-আসেনা। অনেকেই মনে করেন যে, একজাতীয় শীর্ষ গবেষকরা এসব অবৈজ্ঞানিক কাজ কিন্তু সুযোগ বুঝে ও জেনেশুনেই করেন। পাঠকরা, ছাত্ররা, অনেকসময় না জেনে যা বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেন। যাতে জাতিভেদ বিজ্ঞান আশ্রয়ী

এমন ধারণা বিদ্যায়তনিক মহলে প্রশ্রয় পায়। এরকম গবেষণার একটা উদাহরণ এখানে উপস্থাপিত করতে চাই।

জাতপাতের লড়াই না শ্রেণীসংগ্রাম?

তবে তার আগে, রাজনীতির কথা যখন উঠে এল, তখন আরো দু-একটা বিষয় আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজনীয়। প্রথমেই আসব ভারতে জনপ্রিয় যান্ত্রিক সাম্যবাদী রাজনীতি প্রসঙ্গে। গোটা ভারতেই সামাজিক সমাজজীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষণ চিহ্ন জাতি এবং বর্ণ। এই ধরনের মোটা ও সূক্ষ্ম হরেকরকম ভেদাভেদ সামাজিক বৈষম্য বজায় রাখা ও বাড়িতে তোলার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যকেও বহুক্ষেত্রে ছাপিয়ে গেছে। আসলে ভারতে অর্থনীতি ও সংস্কৃতি জাতিবর্ণ স্তরবিন্যাসকে যেখানে লঙ্ঘন করেছে তা গৌণ ও যেখানে তাকে আশ্রয় করেছে তাই মুখ্য। এবং আজ অবধি আমরা এই ছকটা ভাঙতে পারিনি। আমাদের যাবতীয় গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক, সাংবিধানিক বিধিবিধান এই বেলা কাণ্ডজে বাঘ হয়ে রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষিত(?) বাঙালী ভাবের ঘরে চুরি করতে বেড়ে ওস্তাদ। জাতপাত যে টিকে আছে তা মানা হয় না। তর্ক তুলতে গেলে তা ব্যতিক্রমী বলে দাবী করা হয় (বা অস্বীকার করা হয়)। কিন্তু যাঁরা এই সব দাবী করছেন তাঁদের মূল্যবোধ ও আচরণে জাতবর্ণ বিভাজন যেন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। বরং, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি স্বীকার করা হয়।

সুতরাং ভারতে জাতপাতের পরিচয় কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন হয়ে বহাল তবিয়তে টিকে রয়েছে। নিছক অর্থনৈতিক সাম্য এই বৈষম্য মিলিয়ে দেবে, গুড়িয়ে দেবে এমন নয়, আবার তার বদলে নিছক জাতপাতের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই যে সমাজ-অর্থনীতি বদলানো যাবে সেটাও মনে হয় না। জাতপাতের বাস্তব বৈষম্যকে স্বীকার করে ভারতে সমাজ পরিবর্তন আনায় যাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন — সেই আম্বেদকর, লোহিয়ারা ভারতীয় রাজনীতি থেকে যে ক্রমশঃ ব্রাত্য হয়ে গেছেন সেটা একদিকে যেমন ভারতীয় রাজনীতিতে মনুবাদী প্রভাবের নিদর্শন, অন্যদিকে ছকবাঁধা ফর্মুলানির্ভর বামপন্থী ও মার্কসীয় রাজনীতির কর্মফল, যাঁরা সমাজকে সৃজনশীলভাবে ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ করতে পারেনি ও বন্ধুশক্তি বাছতে ভুল করেছে।

একদিকে যেমন আন্তর্জাতিকতার নামে সাম্যবাদী তাত্ত্বিক নেতারা অনেকেই ঐ মহতি তত্ত্বের প্রয়োগমুখী ভারতীয়করণের প্রয়োজনটাকেই অতীতে নাকচ করেছেন আবার অন্যদিকে এসব বিষয়ে যেটুকু কাজ আজকাল হচ্ছে তা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও

প্রতিষ্ঠানের মারফৎ। সেখানে প্রশ্ন এবং তত্ত্ব দুই-ই খাড়া করেন বিদেশি পন্ডিতের দল। যাদের উদ্দেশ্য, বিধেয় সন্দেহজনক এবং অগভীর। অবশ্য সেটা মন্দের ভালো। এইসব তত্ত্বের ওপর ভর করে ভারতের ওপর যেসব সামাজিক গড়াপেটার কর্মসূচী বিগত শতাব্দীতে ঠান্ডাযুদ্ধের পর্বে নেওয়া হয়েছে - তার কোনটাই ঐসব মদতদাতাদের লক্ষ্যপূরণ করতে পারেনি। যদিও দ্বিতীয় দলের প্রয়াস এখনো চলছে।

কিন্তু, চালাকি দিয়ে যে শুধু মহৎ কাজ করা যায়না তা নয়— বড়সড় দীর্ঘমেয়াদী কোনো কাজই ফাঁকি দিয়ে সফল করা যায় না। ভারতে জাতপাতের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে শ্রেণীসংঘাত তীব্র করা ও সমাজকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য সমাজকে জানতে ও বুঝতে হবে। মার্কস, লেনিন, মাও-এর কোটেশন ভুলভাল আউড়ে বা পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের শলাপরামর্শ মেনে চললেই যে সে সব বিদ্যা ভারতে কার্যকরী হবে এমন নয়। ভারতে সমাজ নিয়ন্ত্রণের বাম এবং ডান এই দুই ধরনের অপপ্রয়োগ এখন প্রায় পাশাপাশি চলছে।

জিনছক

ইউনেস্কো জাতিবাদী গবেষণা নিষিদ্ধকরণের ডাক দিলেও তা কার্যত রাষ্ট্রসংঘের নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জিন গবেষণা, বিশ্বব্যবস্থার উচ্চবর্গের এলিট সম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন-জাতিবাদী চিরাচরিত যে কর্মসূচী, অতি দ্রুত তার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠল। আণবিক বস্তুসত্তা বা ডি-এন-এ তাকে বৈধতা দিল। এককথায় তাদের এই ঝোঁককে আমরা বলতে পারি আণবিক বা মলিক্যুলার জাতিবাদ। এর চরম ও খোলামেলা বহিঃপ্রকাশ যেখানে যেখানে দেখা গেছে তা ভর্ৎসিত হয়েছে। ফলে, মৃদু বা মোলায়েম মলিক্যুলার জাতিবাদ তুলনায় ছড়িয়েছে বেশি। সেটাই হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানে জাতিবাদের প্রধান কর্মভূমি। জিনচর্চা ও জিনপ্রযুক্তি যে সমাজে বৈষম্য তাড়াবার বদলে বরং বাড়াবে সেটা এই প্রযুক্তির কর্মকর্তারাও অনেকেই স্বীকার করে নেন। অবশেষে, মানব জিনোমের মানচিত্র আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতা বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা অর্জন করল। জিনছককে বলা হল আত্মোপলব্ধির মহত্তম সোপান। এই ভাবেই একুশ শতকের জিনবিজ্ঞান জাতিবাদের নয়কে হয় করে ফেলল। চারপাশে দেয়াল তোলা একনিষ্ঠ রিডাকশনিস্ট বিজ্ঞানের মধ্য সমাজপ্রভুদের ইচ্ছা কিভাবে প্রবিষ্ট করানো হয় তার এক অনুপম দৃষ্টান্ত-স্থল এই জিনছক ও জিনোম ম্যাপ, জিন ছাপিয়ে যা এখন প্রোটিনছক ও প্রোটিন মানচিত্র তৈরীর দিকেও এগোচ্ছে।

মানুষে মানুষে জিন ও প্রোটিনের বৈচিত্র খোঁজার পথে হাঁটতে হাঁটতে জীব

বিজ্ঞানীদের একাংশ - নৃতত্ত্বদের মধ্যে যে জাতিবাদী মতাদর্শগত প্রবণতা সাম্রাজ্যবাদ রোপণ করেছিল, হয়ত অজান্তেই তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু, তার ফল কোথায় গিয়ে ঠেকছে? জিনের বস্তুবাদী ঘরানার কল্যানে জাত, জিন, নৃতত্ত্ব এখন বিদ্যায়তন ও গবেষণায় অতি ঘনিষ্ঠ - ঠিক যেমনটা ঘটছিল একশো বছর আগে, দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে। মানুষে মানুষে যে জিনগত তফাৎ তাই দিয়ে জাত-জাতির ভেদাভেদ যুক্তিসিদ্ধ করা হচ্ছে। তা নাক গলাচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে। অথচ, যে কোনো তথাকথিত জাতি বা জাতের ব্যক্তিমানুষদের মধ্যে যে জিনগত তফাৎ বিরাজ করে তা যে সবক্ষেত্রেই দুটি জাত বা বর্ণের মধ্যে সামান্যিকৃত কোনো জিনগত পার্থক্যের চাইতে বেশি - এই বিজ্ঞান-প্রমাণিত মূল সত্যটাকে উহ্য রাখা হচ্ছে। ঠিক, এই কারণেই জিনবিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষে বা জনগোষ্ঠীতে জিনগত পার্থক্য নিয়ে গবেষণা করা যায় - কিন্তু জাতি, জাত বা বর্ণকে প্রামাণ্য মেনে নিয়ে কোনো জীববিজ্ঞান বা জিনবিজ্ঞানের গবেষণাই করা যায় না। যায়না, কেননা, জিনবিজ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোনো উপপ্রজাতি রয়েছে বা তা হয়ে উঠছে এমন নয়। যদিও জাতি, জাত বা বর্ণ ঠিক সেই দাবীই করতে চায়। জীব বিজ্ঞানকে এই কাজেই তারা পাশে পেতে একান্ত ইচ্ছুক। যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাকে জৈবিক বলে প্রমাণ করাটাই এই জাতীয় প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই, যে জিন ও জিনোম কেন্দ্রিক বহু অতিকথা ও কষ্টকল্পনাকে প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে দিনরাত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে থাকে প্রতিহত করা মানে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা নয়, বরং সেটাই বিজ্ঞানীদের যথার্থ কাজ। জিন বিজ্ঞানীদের একটা বিরাট অংশও যদিও বিভ্রান্তির খপ্পরে পড়ে গেছেন। আর তা বজায় রাখতে প্রায় নিয়ম করে জিনের সীমা ছাড়ানো অতিকথা ও অপপ্রয়োগকে চাগিয়ে রাখা হচ্ছে।

জিন : আর্য এবং অনার্য

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রেরণায় নৃতত্ত্ব, সাংখ্যায়ণ ও জিনতত্ত্ব মিলিয়ে জাত, বর্ণ এদের নিয়ে গবেষণায় খানিকটা উৎসাহ এ দেশে দেখা দিল। সেই চর্চা সাম্প্রদায়িকতার মত জাতিভেদকেও উস্কানি দিল। জার্মান, জাপান, ইতালির পণ্ডিত গবেষকরাও এতে ইন্ধন যোগালেন সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নিয়ে যতটা আলোকপাত হয়েছে, এই দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে তা হয়নি। যুদ্ধান্তে রাষ্ট্রসংঘের জাতি বিষয়ক ঘোষণায় খানিক পরিমাণে এই পাপ মুক্তির লক্ষ্যে ভারত থেকে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেন হুমায়ুন কবির। সে সব কথা আমরা ভুলে গেছি।

কিন্তু ভারতে জাতপাত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহ কমেনি। ১৯৫০ থেকে অন্যান্য আরো কিছু দেশের পাশাপাশি মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকরা ভারতের আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের নিয়ে নানা জাতপাত ও সামাজিক (ন্যক্কারজনক) পরীক্ষানিরীক্ষা চালান — যদিও তাতে জিনতত্ত্বের প্রত্যক্ষ সংযোগ তেমন ছিল না ভারতে জিনবিজ্ঞানীদের জাতপাতের গবেষণায় টেনে আনার প্রয়াস তাই প্রায় নতুন করে শুরু হল হিউম্যান জিনোম প্রকল্পের পরবর্তী অধ্যায়ে। এই পর্বে মানুষের ক্রমবিকাশ বা ইভলিউশন বিষয়ে গবেষণার নামে মানুষের জিনের নমুনা সংগ্রহের হিড়িক যখন ছড়িয়ে পড়ল, সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল ভারতে। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল আদিবাসী ও মূলবাসী মানুষজন। জিনের নমুনা পাবার জন্য রক্ত সংগ্রহের এই ব্যাপক অভিযানকে সে সময় আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা নাম দেন রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার প্রজেক্ট। এই জিন নমুনা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর প্রফাইলিং ও গোপন গোয়েন্দাগিরির জন্যও জরুরী ছিল। আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক নমুনা সংগ্রহের মধ্যও সেই উদ্দেশ্য লুকনো আছে। কিন্তু সরাসরি জাতপাত বিষয়ক গবেষণাও এই পর্বে আর অচ্ছুৎ রইল না।

অবশেষে, নেচার পত্রিকায় ২০০৯ সালে একটি গবেষণাপত্র বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হল। ভারতের নামজাদা জিন-গবেষক এবং একটি শীর্ষ গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা লালজি সিং দুজন মার্কিন গবেষকের সঙ্গে যৌথভাবে কাজটি করলেন। নমুনা যোগাবার কাজটা করলেন লালজি সিং, কিন্তু বিশ্লেষণের কাজটা মূলত ডেভিড রিখের। রিখ হার্ভার্ড এবং এম আই টি-র সঙ্গে যুক্ত ব্রড ইনস্টিটিউটের একজন শীর্ষ বিজ্ঞানী। ভারতের জিন ও জাতি গবেষণা তাঁর অন্যতম আগ্রহের বিষয়। ডেভিড রিখ, অল্প কিছু জিনের নমুনা থেকে এটা দাঁড় করাতে চান যে, ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের আড়ালে রয়েছে দুটি মাত্র প্রধান বংশানুক্রম। এদের একটিকেএরা বলেন আদি উত্তর-ভারতীয় রূপ (ANI- Ancient North Indian)এবং অপরটি আদি দক্ষিণ ভারতীয় (ASI - Ancient South Indian)। বস্তুত, যা ভারতে জাতিবাদের আদিরূপ, আর্য ও অনার্য তত্ত্ব নতুনভাবে সসম্মানে ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা।

উত্তর বনাম দক্ষিণ

বিজ্ঞানের নামে চালানো হলেও আসলে এইসব গবেষণা হল রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পাথেয়। ভারতীয় রাজনীতির একটি প্রধান অক্ষ যে আঞ্চলিকতার দ্বন্দ্ব তা গত কয়েক দশকে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতা